নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৯, পৃঃ ২১-৩৫
© ২০০৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পশ্চিমের উদারনৈতিক হেজেমনিতে বসবাস ঃ 'জিনিয়্যালজিস অফ্ রিলিজিয়ন' এর পাঠ-প্রতিক্রিয়া

সাঈদ ফেরদৌস *

১. তালাল আসাদের 'জিনিয়্যালজিস অফ্ রিলিজিয়ন ঃ ডিসিপ্লিনস এ্যান্ড রিজনস অফ পাওয়ার ইন ক্রিশ্চিয়ানিটি এ্যান্ড ইসলাম' বইটা মূলতঃ অনেকগুলো প্রবন্ধের সংকলন; স্থানও কালের দিক হতে যে প্রবন্ধগুলো বিষয়বস্তুগতভাবে বৈচিত্র্যময়। তবে এই বৈচিত্র্যের মাঝে মিলের জায়গা হলো, আসাদ সবগুলো প্রবন্ধে 'পশ্চিমা ক্ষমতা আর তার হেজেমনি'র বিষয়টিকে মনোযোগে রেখেছেন। এই বিষয়টিকে দেখতে গিয়ে তিনি প্রধান প্রেক্ষিত হিসেবে ধর্ম ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করেন। তার মতে ইদানীংকালে ধর্মকে যে আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিক বিষয় হিসেবে দেখা হয় তা মূলতঃ ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমে সৃষ্টি হয়েছিলো; যাকে আজকাল সহসাই সার্বজনীন বলে দাবী করা হয়, কিংবা অন্ততঃ তেমনটাই মনে করা হয়। অন্যপক্ষে তিনি দেখাতে চাইছেন ধর্মের এই সরলীকৃত পশ্চিমা ব্যাখ্যা অ-পশ্চিমা ধর্ম যথা ইসলামকে বুঝতে কিভাবে অক্ষম। ধর্মকে বুঝবার ক্ষেত্রে পশ্চিমা হেজেমনিকে উন্মোচনের পাশাপাশি তিনি ঐ হেজেমনির জ্ঞানকান্ডীয় চর্চা যেমন নৃবিজ্ঞান বা ইতিহাসের পরিসরে তা কিভাবে কাজ করে সেটা সনাক্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমা ধ্যানধারণা, অনুমিতি এবং আয়োজন কিভাবে অপশ্চিম কে নির্মাণ করতে, তাকে রূপ দিতে তৎপর। আসাদ এই হেজেমনির ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজেছেন পশ্চিমের ঔপনিবেশিক, উত্তর-ঔপনিবেশিক, আধুনিক ও উদারনৈতিক আধিপত্যের মধ্যে। উপরন্তু তিনি তার বিশ্লেষণ হতে আগুবেড়ে আরো বলেছেন, কিভাবে স্ব-সীমাবদ্ধ উদারনৈতিক ঐতিহ্য সমকালীন বহুজাতিক, বহুসাংস্কৃতিক পশ্চিমা জাতি রাষ্ট্রের (যথা বৃটেনের) রাজনীতি ও চর্চায় বিরাজমান । আমি এই আলোচনার শুরুতেই আসাদের কেন্দ্রীয় ঐতিহাসিক এবং

* সকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমপিরিক্যাল মনোযোগ ধর্ম ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়টিতে দৃষ্টি দেবো। ক্রমান্বয়ে আমি পশ্চিম-অপশ্চিমের সম্পর্কের বৃহত্তর প্রেক্ষিত বুঝতে, অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক বুঝতে মন দেবো তা থেকে আসাদের ধ্যান-ধারণার একটা মানচিত্রও বোঝা যাবে; দেখা যাবে পন্ডিত হিসেবে তিনি কিভাবে নিজের জায়গাকে স্বতন্ত্র করেছেন, খুঁজে নিয়েছেন। সবশেষে আসাদের কাজ সমকালীন বাস্তবতা বুঝতে আমাকে কিভাবে সাহায্য করে তা আমি বলবার চেষ্টা করব।

১.১ ধর্ম ও ক্ষমতা কি করে অন্তঃপ্রবিষ্ট তা দেখাতে আসাদ মধ্য যুগের খৃষ্টধর্মের ময়না তদন্ত দাঁড় করান। আধুনিক সমাজে মনে করা হয়ে থাকে যে, মধ্যযুগে আইনী নির্যাতন এর প্রতিষ্ঠা ছিল মিথ ও ধর্মকে ছাড়িয়ে যৌক্তিকতার দিকে এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ (পৃঃ ১২১)। খৃস্টধর্মের ইতিহাস হতে প্রসঙ্গ টেনে আসাদ এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ মতবাদকে নিরিখ করে দেখেছেন। আসাদের মতে সত্যে পৌছবার জন্য ধর্ম না আইন কোনটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য সেই ভাল কিংবা মন্দ পদ্ধতি বাছাইয়ের বিষয় এটা নয়। অপরাধের মীমাংসা করতে গিয়ে সত্য উদঘাটনের জন্য প্রথমোক্ত পন্থাটি (ধর্ম) শরীরের ওপর প্রত্যক্ষভাবে কায়েম হতো-সহিংসতার মাধ্যমে। অন্য দিকে দ্বিতীয় পন্থায় (আইনী নির্যাতন) সহিংসতাকে একটা সত্য উদঘাটনকারী/সনাক্তকারী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতো (পৃঃ ১২২), যেমনটা হরদম এখনও করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে সহিংসতাজনিত যে যন্ত্রণা তা ছিলো পূর্বে সংঘটিত কোনো অপরাধের শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যন্ত্রণা প্রয়োগ করা হতো সত্য বের করার জন্য/ নির্ধারণের জন্য। আসাদ একারণেই ধর্মের চাইতে আইনী পন্থাটিকে 'অধিকতর যৌক্তিক' বলে মানার ব্যাপারে সংশয়ী। সচরাচর মনে করা হয় যে, তদন্ত ব্যবস্থায় (আইনী) নির্যাতনের এই যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ধর্মীয় শক্তির উপর সমাজের যে নির্ভরশীলতা ছিল অতীতে, তা থেকে সরে আসা। কিন্তু আসাদ বলেন বিষয়টি মোটেই সে রকম নয়। বরং এই নির্যাতনকে যুক্তিশীল হিসেবে দেখার বিষয়টি ধর্মীয়যাজক প্রতিষ্ঠান আর তার চর্চার মধ্যেই লুকানো ছিলো। আইনী নির্যাতন প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই চার্চের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। আর তার সম্প্রসারণ সমগ্র ধর্ম ব্যবস্থার প্রায়শ্চিত্তের সম্প্রসারণকেই ইংগিত করে। তাই আসাদ বলেন ক্ষমতা আর যুক্তিশীলতা মধ্যযুগের ধর্মেও ছিলো। তিনি আরো বলেন, যেভাবে (ধর্ম=অযুক্তি হতে) যুক্তিশীলতার পথে উত্তরণ ঘটে এবং যেভাবে আলোকদয়-উত্তর একমেবাদ্বিতীয়ম স্যেকুলার ইতিহাস কোনো ধরণ বিশেষকে (যথা এই আলোচনায় আইনী চর্চাকে) বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে গণ্য করে, তা আদতে ধর্মের মতোই পরাক্রম-প্রবণ; ওল্ড টেষ্টামেন্টের ঈশ্বরের মতোই মানব জাতিকে সে তার ভুল আর খামতির জন্য শাস্তি দেয় (পৃঃ ১২৩)।

আসাদ এই আলোচনায় ধর্ম বনাম স্যেকুলার, যুক্তিশীলতা, প্রগতি এই ডিসকোর্সগুলোকে খন্ডন করেন। তার মতে ধর্মকে ছেড়ে আইনের পথে এগুনোই যুক্তিশীল নয় যদিও তেমনটাই দাবী করা হয়। ধর্ম সরাসরি বল প্রয়োগ করে বলে তাকে নৃশংস মনে করা হয়। কিন্তু আইনী বলপ্রয়োগকে নির্দোষ ভাবা হয়। এই ভাবনার সাথে উদারনৈতিকতাবাদের ওতোপ্রতো সম্পর্ক। আদতে আসাদ তাকেই আক্রমণ করেন। তিনি দেখান আইনী বলপ্রয়োগ অপরাধ সংঘটনের আগেই ঘটছে- ধর্মীয় বলপ্রয়োগ প্রকাশ্যে ও অপরাধ সনাক্তকরনের পর ঘটছে। তিনি আদতে আরো বলেন যে, যুক্তিশীলতা ধর্মকে ছাড়িয়ে প্রগতির দিকে যাওয়া নয়। বরং ধর্মের কালেও সমাজে যুক্তিশীলতা ছিলো- স্যেকুলার/যুক্তিশীল হতে ধর্মকে পৃথক করা ধোপে টেকেনা। আর তথাকথিত যুক্তিশীল/স্যেকুলার সমাজেও (যথা এই ক্ষেত্রে আইনে) ধর্মীয় উপাদান বিরাজমান।

১.২ খৃস্টধর্মের ময়নাতদন্তের দ্বিতীয় ভাগে আসাদ সেক্যুলার কর্তৃত্বের কাছে সত্তার স্বচ্ছা আনুগত্য ও সমর্পণ কি করে ঘটলো (পৃঃ ১৬৫) তা দেখিয়েছেন। দু'ধরণের ক্ষমতা সনাক্ত করে তুলনামূলক আলোচনা হতে আসাদ দেখান যে আনুগত্য ও সমর্পন আদায়ে ধর্মীয় ক্ষমতার চাইতে সেক্যুলার ক্ষমতা কোন অংশেই কম পটু নয়। তার মতে ধর্মীয় ক্ষমতা মানবিক গুণাবলী তৈরী করে। স্যেকুলার স্বাধীন সত্তাকে অবদমন করা এই ক্ষমতা ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিলো না। ধর্মীয় আকাংখা তৈরী করাই ছিলো তার মূল আরাধ্য। উপরন্তু আসাদ ধর্মীয় প্রায়শ্চিত্তের আচার কিভাবে পর্যবেক্ষণ, সংশোধন আর শাস্তির প্রক্রিয়াকে রূপ দেয় তার উপর জোর দিয়েছেন। সেই আলোচনা হতে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে ধর্মীয় কিংবা আচারগত আচরণ সকল সময় আটপৌরে কিংবা বাস্তব আচরণের বিপরীতে অথবা ধর্ম সকল সময় যুক্তি কিংবা বিজ্ঞানের বিপরীতেও দাঁড়ায় না (পৃঃ ১৬৭) তবে আসাদের কাছে যাজকীয় তথা ধর্মীয় আচার গরুত্বপূর্ণ কেননা তার কিছু উপাদান পরের শতকগুলোতে স্যেকুলার প্রকল্পে আত্তীকৃত ও রূপান্তরিত হয়েছে (পৃঃ ১৬৬)।

অথচ এই আত্তীকরণ সত্ত্বেও পশ্চিমের খৃস্ট-উত্তর ধারায় খৃস্টীয় মতবাদ ধর্ম হিসেবে একদিকে সামষ্টিক সত্তার বিপরীতে ব্যক্তিক, স্বতন্ত্রের অনুভূতির বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মকে জীবনের নিছক এক প্রেক্ষিতমাত্র হিসেবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। এহেন ব্যাখ্যা ধর্মকে ক্ষমতা হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (পৃঃ ২৮)। আজকের দিনে কোনো আধুনিক সমাজে পাবলিক ক্ষেত্রের সাথে

ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা নেই; বা জীবনের একটা প্রেক্ষিত অর্থেও তা বিজ্ঞান কিংবা রাজনীতির মতো গুরুত্ববহ প্রেক্ষিত নয়। ধর্ম এখন স্বতন্ত্র ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের/চয়নের উপর নির্ভরশীল; প্রেক্ষিত হিসেবে তা অনাবশ্যিক, ঐচ্ছিক। খৃস্টধর্মের এই আমূল পুণর্গঠন আধুনিক জ্ঞান ও ক্ষমতা, তথা জাতি-রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সংগতি রেখে জায়গা করে নিয়েছে। এটা রেনেসাঁর ফলাফল, যা মনকে দেহ হতে পৃথক করে, বাস্তবকে আধ্যাত্মিক হতে পৃথক করে (পৃঃ ৬৬) যা রেনেসাঁ পূর্ব সময়ে অবিচ্ছেদ্য ভাবা হতো। এই পুণর্গঠনের কালে ধর্মীয় চর্চার শিক্ষা গ্রহণটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা অতীতে স্বতন্ত্র করে শিখবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এই পর্যায়ে প্রথাসিদ্ধ চর্চাগুলোকে ব্যক্তি সত্তা হতে পৃথক করা হয় এবং তা ক্ষমতার খেলার অংশে পরিণত হয়। এই সময়ে বিকশিত হয়েছে ক্ষমতার অন্য রূপটি-আইনী চর্চা। যা সেক্যুলার সত্তার উপর নিজের নিয়ন্ত্রনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বোধগম্য কারণেই এহেন স্যেকুলারকরণ কে হামেশাই উস্কে দেয়া হয় উদারনৈতিক রাজনীতি আর আধুনিকতার ভুবন বোধের সাফাই গাইতে। নিজের এহেন স্যেকুলার দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠার পর হতে, পশ্চিম নিরন্তর ইসলামিক রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে অনুমিতি তৈরী করে যাচ্ছে। নিজের ইচ্ছে মতো নিরংকুশবাদী (absolutist) রাষ্ট্র হিসেবে তাকে এঁকে যাচ্ছে, অভিযুক্ত করে যাচ্ছে; বলা হচ্ছে সেখানে স্বাধীন মত প্রকাশের, পাবলিক সমালোচনার কোনো অবকাশ নেই (পৃঃ ২০০)। আর ধর্ম ক্ষমতা ও পরস্পর সম্পর্কিত বিধায় তাকে যুক্তি ও আধুনিকতার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে যাচ্ছে। বিপরীতে আসাদ তর্ক জুড়ছেন যে, ইসলামে ক্ষমতা কিভাবে সকল সময়েই অবদমনমূলক নয়। তিনি উদাহরণ হিসেবে সমকালীন সউদী আরবকে হাজির করছেন, যা ব্যাপক অর্থে অন-উদার কতৃত্বশীল সমাজ হিসেবে পরিচিত (যা অনেকাংশেই সত্যও হয়তো)। অথচ আসাদ দেখাচ্ছেন এমনকি এহেন সমাজের ভেতরেও উলামারা ধর্মীয় যুক্তি ব্যবহার করেই রাষ্ট্র ও শাসকের সমালোচনায় সরব হচ্ছেন, পাবলিক যুক্তি চর্চার পরিসর তৈরী করছেন (পৃঃ ২২৩)। এভাবেই কর্তৃত্বশীল মুসলিম সমাজ সম্পর্কিত অনুমিত সমরূপতাকে খন্ডন করে, বিপরীতে আসাদ জ্ঞপাবলিকঞ্চ পরিসরের অগ্রগণ্য তাত্ত্বিক কান্ট এর দৃষ্টান্ত টানছেন; দেখাতে যে, পশ্চিমের উদার ঐতিহ্যের ভেতরেও পাবলিক পরিসরের সীমারেখা কতোটাই নির্দিষ্ট - রাষ্ট্র শাসকের সমালোচনার প্রশ্নে (পৃঃ ২০৪)। তিনি উদারনৈতিকতাবাদের স্ববিরোধিতাকে প্রশ্ন করছেন। তালাল আসাদের *নাসিহা* (পৃঃ ২১৪) আলোচনা দেখায় যে, কিভাবে ইসলাম ধর্ম হিসেবে মোটেই ব্যক্তিক বিশ্বাসে আবদ্ধ নয়। বরঞ্চ *নাসিহা* ইসলামের

এমন এক উপাদান যা ধর্মীয় যুক্তি ও চর্চার এক আদান প্রদান মূলক পাবলিক পরিসর তৈরী করে; এই বিষয়টা পশ্চিম হতে একেবারেই ভিন্ন (পৃঃ ২১৮) বিষয়টা লেখকের ঐ যুক্তিকেই প্রমান করে যে, ঐতিহাসিকভাবে ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে গড়ে ওঠা একটা সরলীকৃত তত্ত্ব ইসলামকে ধর্ম হিসেবে বুঝতে অক্ষম।

২. অন্যদিকে আসাদের মতে, এই উত্তর-খৃস্টীয় যুগে যখন কিনা ধর্মকে খুবই অগুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিক, আধ্যাত্মিক ও ক্ষমতা বিযুক্ত বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে, তখনও পশ্চিমা উদার বহুসাংস্কৃতিক, গণতান্ত্রিক সেক্যুলার রাষ্ট্র খৃস্টীয় ঐতিহ্যকেই লালন করে চলেছে। এই যুক্তির প্রমাণ দিতে গিয়ে আসাদ বৃটেনে ঘটে যাওয়া রুশদী বিতর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন। যখন *স্যাটানিক ভার্সেস* ছাপা হলো তখন লন্ডনে ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম প্রকাশ্যে তাদের ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেছিলো। সে সময় রাষ্ট্র মুসলিমদের এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, তারা যাতে তাদের আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করে ফেলে। তখন সেখানে গুরুত্ব দেয়া হয় নিজেদের বিশ্বাস নষ্ট না করেও জাতিগত সংখ্যালঘুদের যথাযথ আত্তীকরণ আর বৃটিশ সংস্কৃতি শেখার উপর। বৃটিশ সরকারের এহেন অবস্থান নেয়া সেখানকার উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিলো (পৃঃ ২৩৯)। অন্যদিকে মুসলিমরা সেখানে যেভাবে ধর্মের রাজনীতিকরণ ঘটায়, স্বতন্ত্র ধর্মীয় স্কুলের দাবী তোলে, তাও ঐ একই ধরণের উদার রাজনৈতিক মতাদর্শের বুমেরাং ফলাফল; যে মতাদর্শ অনুযায়ী যার যার নিজের বিশ্বাস আর চর্চা বেছে নেবার স্বাধীনতা সকলেরই থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ পশ্চিমা রাষ্ট্র এই বিন্দুতে এসে এইসব দাবীকে জায়গা দিতে অপারগ, কেননা এইসব দাবীকে সে তার নিজের (উদার, সেক্যুলার রাষ্ট্রের)সত্তা ও সংস্কৃতির জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে। এখানেই আসাদ প্রসঙ্গটিকে ক্ষমতার সাথে যুক্ত করে দেখেন; তার মতে কোনো সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধ্যানধারনা আদতে হলো ঐখানকার আধুনিকায়নকামী রাষ্ট্রের প্রকল্প মাত্র। রাষ্ট্রের আশ্রয়ে থাকা মানুষজন নিজেদের কিভাবে চিনবে, তাদের পরিচয়ের কোন স্মারককে তারা বেছে নেবেন, তা-ও ঐ প্রকল্পেরই অংশমাত্র। আর বলাই বাহুল্য বৃটেন নামক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার সাম্রাজ্যের ইতিহাস এহেন প্রকল্পের পেছনে দাঁড়িয়ে (পৃঃ ২৪৮)। এহেন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র তার অধীনস্তদের কেবল অবদমিতই করে না, তাদের রূপান্তরণও ঘটায় (পৃঃ ২৫৩), অর্থাৎ তার ইচ্ছেমতো নতুন পরিচয় ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর গায়ে এঁকে দেয়। এই রকম একটা ব্যবস্থার মধ্যে বৃটেনে মুসলিমরা যখন নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের

সাপেক্ষে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দাবী করে নিজস্ব কতৃত্ব তৈরীর চেষ্টা করে, তখন তা জাতিরাষ্ট্রের মতাদর্শিক ঐক্যের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কিংবা হুমকি হিসেবে প্রতিপন্ন হয় (পৃঃ ২৬৮)।

স্যাটানিক ভার্সেস এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আসাদ বলেন যে, বৃটিশ উদার রাজনীতির যে কেতা, তার মূল জটিলতা হলো, তা অধীনস্ত অভিবাসীদেরকে শ্বেতাঙ্গ কর্তার বিভ্রান্তিকর (আইনী) ধারা ও বাগধারার ফাঁদে আটকে রাখতে চায়; যা কিনা বৈশিষ্ট্যগতভাবে খৃস্টীয় অথচ সেক্যুলার, রক্ষণশীল অথচ উদার, অবদমনশীল অথচ অনুমোদনকারী (কাউটে ৮৯, পৃঃ২৮২)। আসাদ নির্দিষ্ট করে রুশদীর লেখালেখি বিশ্লেষণ করে দেখান, কি করে তা বৃটিশ উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মতুষ্ট সত্তারই প্রতিফলন ঘটায়, যে কিনা অভিবাসীদের ফান্দে পড়া নিয়ে তামাশা দেখে, হাসে (পৃঃ ২৯৫)। আবার গল্প আর সাহিত্যের নামে, সৃজনশীল লেখালেখির উদার, বুর্জোয়া উদযাপনের নামে তাকে বৈধতাও দেয়া হয় (পৃঃ ২৮৭)। তাই নিজেদের জীবন নিয়ে বানানো মস্করার প্রতিবাদে মুসলমানরা সোচ্চার হলে, সৃজনশীলতা, সৃজনশীলের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে উদারনৈতিক সমাজ এহেন প্রতিবাদ কে ধিক্কার দেয়, আর রুশদীকে মাথায় তুলে রাখে। আসাদ বলেছেন, ভাবটা এমন যে গল্প আর সাহিত্য জীবনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বোধ যেন বা সার্বজনীন। আর এভাবেই রুশদীর বই উদার বহুসাংস্কৃতিক বৃটেনের রাজনৈতিক অঙ্গনে অভিবাসীদের ঠ্যাঙ্গানোর লাঠির কাজটাই করে থাকে (পৃঃ ৩০৩)।

৩. ধর্ম আর ক্ষমতার সম্পর্ক উদঘাটন করতে গিয়ে তালাল আসাদ নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ইত্যকার জ্ঞান কান্ডের কিছু চিরায়ত ও সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে মতভিন্নতা দাঁড় করিয়েছেন। এসব নানা সময়ের নানা রকমের তত্ত্ব কিভাবে পশ্চিমা উদার দৃষ্টিভঙ্গীর মাঝে প্রোথিত, কিংবা তার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়ানো, কিভাবে তারা পশ্চিমা আধিপত্যের উদ্দেশ্যই হাসিল করে তা আসাদের দেখবার অন্যতম বিষয়।

৩.১. প্রতীকি নৃবিজ্ঞানের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ তার ধর্ম বিষয়ক তত্ত্বের (১৯৭৩) জন্য ব্যাপক সমাদৃত। তার তত্ত্বে গিয়ার্টজ ধর্মকে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, আসাদের মতে ধর্মের এই ব্যাখ্যা ধর্মকে একটা অধি-ঐতিহাসিক সারসত্তা হিসেবে নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে, তার একটা

সার্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর প্রয়াস নিয়েছে, যা সমস্যাজনক। কেননা আসাদ বলছেন এই সংজ্ঞাও খোদ একটা ডিসকার্সিভ প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক ফলমাত্র (পৃঃ ২৯)। গিয়ার্টজ এর স্ববিরোধিতাপূর্ণ প্রতীক এর ব্যাখ্যা এবং ধর্ম বিশ্লেষণে এই ব্যাখ্যার প্রবল উপস্থিতি নির্দেশ করে আসাদ বলেন, প্রতীক কোনো বস্তু বা ঘটনামাত্র নয় যা অর্থ বহন করে (যেমনটা গিয়াটজ বলেছিলেন); বরং তা বস্তু ও ঘটনাসমূহের মধ্যকার একসারি সম্পর্ক। গিয়ার্টজীয় বিশ্লেষণ প্রতীককে একটি সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ কিংবা একটি প্রত্যক্ষণযোগ্য সত্তা হিসেবে গণ্য করে, তাকে সামাজিক এবং মনোজাগতিক বাস্তবতা হতে পৃথক করতে চায়। অন্যদিকে আসাদ বলছেন, প্রতীকের নির্মাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে কিছু প্রতীক অন্যগুলোর চাইতে স্বাভাবিক, কিংবা কর্তৃত্বশালী হয়ে উঠলো, কিভাবে এই চর্চা আবার বর্জন প্রবণ (exclusionary), তা তদন্ত করা প্রয়োজন। এ ভাবেই আসাদ কিছু নির্দিষ্ট প্রতীকের নির্মাণে ক্ষমতার প্রসঙ্গটিকে সামনে আনেন এবং স্বাভাবিকীকরনের বিরুদ্ধে কথা বলেন (পৃঃ ৩৫)। গিয়ার্টজ এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে অগ্রাহ্য করে অর্থের প্রবল উপস্থিতির উপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়েছেন। এ ভাবে গিয়ার্টজ, আসাদ বলেন ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিকোণকেই বেছে নিয়েছেন (পৃঃ ৪৩)। ধর্মকে সেক্যুলার হতে পৃথক করবার গিয়ার্টজীয় এই প্রবণতা বিশ্বজয়ী আধুনিকতার ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ (পৃঃ ২৯)। তিনি যেভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে দেখেন, তা আধুনিক, ব্যক্তিগত এবং খৃস্টীয় (পৃঃ ৪৭)। এহেন দৃষ্টিভঙ্গী অন-আধুনিক, অ-খৃস্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চাকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। গিয়ার্টজ ধর্মীয় প্রতীককে সামাজিক জীবন হতে বিচ্ছিন্ন করেন এবং অতঃপর তাদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরীর চেষ্টা করেন। আসাদ আরও আগুবেড়ে বলেন যে, ধর্ম সচারাচর অধিপতি ক্ষমতাকে সমর্থন দেয়; তার ভিন্ন ভিন্ন ধরণের চর্চা আর ডিসকোর্সকে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যেই দেখতে হবে (পৃঃ ৫৪)।

৩.২ বৃটেনের রুশদী বিতর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আসাদ পল গিলরয় এর বহুসাংস্কৃতিকবাদ আর ভাভার হাইব্রিডিটির ধারণার অপর্যাপ্ততার উপর আলোকপাত করেন। তাঁর মতে সংস্কৃতির অবশ্যই সীমারেখা রয়েছে, যদিও তা ধ্রুব বা অনড় নয়। সংস্কৃতিকে একটা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার মানে এই সম্ভাবনাকে বাতিল করা নয় যে, সংস্কৃতি একটা সংহত বা সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা; আবার একটা সংহত/সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই বৈপরীত্যহীন হবে তাও নয় (পৃঃ ২৬৩)। নির্দিষ্ট উদাহরণ ধরে তালাল আসাদ প্রশ্ন করছেন বৃটেনে অভিবাসী

দক্ষিণ এশীয় মানুষজন কি করে তাদের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ভিন্নতাকে রক্ষা ও লালন করবে, যদি তাদের ঐতিহ্য আর সত্তাকে একটা অখন্ড থাকবার আকাংখা হিসেবে না দেখা যায়? (পৃঃ ২৬৪)। তার মতে গিলরয় কিংবা ভাভা, কেউই স্হিতাবস্থার রক্ষকদের নিয়ে বিন্দুমাত্রও উদ্বিগ্ন ছিলেননা (পৃঃ ২৬৫)। আসাদ আরও বলেন যে শাসক রাজনৈতিক ক্ষমতার কূট-কৌশল হলো, যে জনগোষ্ঠীকে সে শাসন করতে চায়, তার সুস্পষ্ট ঐক্যকে সে অস্বীকার করে। এই জায়গায় এসেই ভাভা, গিলরয় বা তাদের মতো উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিকদের চিন্তা, নাগরিক, ভোগী পুঁজিবাদ আর তার উদার উদযাপনের কোলে ঠাঁই পেয়ে যায় (পৃঃ ২৬৬); যা অবশ্যম্ভবী রূপে বহুজাতিক পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রের সাথে মানানসই। মজার ব্যাপার হলো বহুসাংস্কৃতিক জাতিরাষ্ট্রের এক তাত্ত্বিক (বাউম্যান, ২০০০) আসাদকে উর্দ্ধৃত করেন তার মধ্যযুগীয় খৃস্টধর্ম বিশ্লেষণের জন্য, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবেই রুশদী বিতর্কের প্রেক্ষিতে আধুনিক বহুসাংস্কৃতিক বৃটেনের যে বিশ্লেষণ আসাদ করেন সে প্রসঙ্গে ভালোমন্দ কিছু না বলে বরং বিষয়টি তিনি একদমই চেপে যান। এহেন দৃষ্টিভঙ্গী বোধ করি প্রকারান্তরে এসব তত্ত্ব সম্পর্কে আসাদের উপর্যুক্ত মন্তব্যকেই সত্য প্রমাণ করে।

৩.৩ জেমস ক্লিফোর্ড হচ্ছেন সেই সকল নৃবিজ্ঞানীদের পথিকৃৎ, যারা উত্তরাধুনিকতাবাদী সাবজেক্টিভিটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এথনোগ্রাফিক রচনার রাজনীতি প্রসঙ্গে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত ঘটান। অথচ তালাল আসাদ দেখাচ্ছেন, কি করে অসম ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, ক্লিফোর্ড সত্তার স্থানচ্যুতির ঘটনাকে বিষ্ময়করভাবেই উদযাপন করেন (পৃঃ ৯)। ভূমিকাতে হান্নাহ আরেন্ডট (১৯৭৫) কে উদ্ধৃত করে আসাদ, উদ্ভাবনী মানব এজেন্সি এবং স্থানচ্যুতি এই দুই বিষয়ে ক্লিফোর্ডের (১৯৮৮) উদ্যাপনের বিপরীত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেন। আরেন্ডট মানুষের ছিন্নমূল হওয়া আর ভেসে যাবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন, যা তার মতে আধুনিক জনতার হীনতম দশা; শিল্প বিপ্লব হতে বিষয়টির শুরু, সাম্রাজ্যবাদে তা তীব্রতম রূপ লাভ করেছে (পৃঃ ১০)। আসাদের মতে আরেন্ডট দেখিয়েছেন কি করে অধিপতি ক্ষমতা সচলতার ডিসকোর্সের কথা বলে প্রকারান্তরে নিজেকে কায়েম করে। এই সচলতা নিছক কোনো ঘটনামাত্র নয়, বরং তা এমন এক মূহূর্ত, যখন একসত্তা (এখানে আশ্রয়দানকারী, মেজবান রাষ্ট্র) অপরের (এখানে অভিবাসী মানুষজন) উপর নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে (পৃঃ ১১)। তাই এই সচলতা বা কেন্দ্রচ্যুতির আরেক নাম ছিন্নমূল হওয়া, ভেসে

যাওয়া, যা নিছকই ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন কোন বিষয় নয়। অথচ যারা মানব এজেন্সি আর কেন্দ্রচ্যুত সত্তাকে নিয়ে মাতামাতি করেন তারা এই বাস্তবতা ভুলে যান।

৩.৪ একইভাবে তালাল আসাদ ঐ সকল নৃবিজ্ঞানীরও সমালোচনা করেন, যারা স্থানিক মানুষজনকে তাদের নিজ ইতিহাসের 'রচয়িতা' (পৃঃ ৩) হিসেবে আবিষ্কার করেন, অথবা ধরে নেন যে ঐসব মানুষেরাই বাস্তবের মানুষ, যারা বাস্তব কাজটা করছেন (পৃঃ ৫)। এ সকল যুক্তি ঐ মানব-এজেন্সি সন্ধানী দাবীর উপরই প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানিক মানুষজন নিছকই অবলা, কিংবা ঔপনিবেশিত সত্তা নয়; কিংবা তাদের জীবন পশ্চিমা পুঁজিবাদ দ্বারা নির্দ্ধারিত নয়। শাহলিনস, অর্টনার এ প্রসঙ্গে আলোচনায় এসেছে। আসাদ 'রচয়িতা' ধারণাটার অস্পষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং পরিষ্কার করে দেন যে রচনার ক্ষমতা বয়ানের সাথে নিবিড় সম্পর্কিত (পৃঃ ৪)। বিপরীতে তিনি আরো যুক্তি দেন যে, যে কেউই একটা পর্যায় পর্যন্ত অন্যের বিষয়/অধীন (অবজেক্ট), তাই যে কাউকেই 'রচয়িতা' ধরে নেয়াটা বেশ সমস্যাজনক। উভয় নৃবিজ্ঞানীকে উদ্ধৃত করেই আসাদ দেখান, কিভাবে তারা বিশ্ব পুঁজিবাদের অস্তিত্বমানতাকে মেনে নিয়েছেন। যেমন শাহলিনস স্পষ্টতঃই লিখছেন বৃহত্তর ব্যবস্থার সম্পর্ক আর পণ্যগুলো স্থানিক পর্যায়ে বস্তুসমূহের বিন্যাসে অর্থপূর্ণ জায়গা করে নিচ্ছে। আর এমনটা ঘটার অর্থ দাঁড়ায় যে, স্থানিক জনগণ তাদের নিজেদের ইতিহাসের 'রচয়িতা' মোটেই নয় বরং অবলা বিষয় মাত্রেই পরিণত হচ্ছে (পৃঃ ৪)। আসাদ তার পাঠকদের আরো মনে করিয়ে দেন, কিভাবে 'স্থানিক জনগণ' প্রত্যয়টি 'আদিম', 'উপজাতীয়', 'সরল', 'প্রাক-অক্ষর' ইত্যকার একসারি প্রত্যয়ের বিকল্প হিসেবে হাজির হয় (পৃঃ ৭)। তার মতে 'স্থানিক' আর 'বৈশ্বিক' প্রত্যয় হিসেবে ক্ষমতার ওজন প্রকাশে তখনই কেবল সক্ষম হতে পারে, যখন কিনা 'স্থানিক' হলো প্রোথিত, বদ্ধ, সীমাবদ্ধ, সনাক্তযোগ্য; অন্যদিকে যারা 'স্থানিক' নয়, তারা হলো হয় স্থানচ্যুত, ছিন্নমূল, দিকভ্রান্ত, কিংবা ইতিবাচক অর্থে অসীম, বিশ্বজনীন, কসমোপলিটন, যারা কিনা সারা পৃথিবীর কাছেই অস্তিত্বমান (পৃঃ ৮)।

৩.৫ তালাল আসাদ নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের ঐ প্রবণতারও সমালোচনা করেন, যারা নিম্নবর্গের মানুষজনের খাঁটি সত্তার সন্ধান করে তাদের চৈতন্য খুঁজে বেড়ান; তাদের কর্তাদের থেকে ঐসব মানুষদেরকে স্বতন্ত্রভাবে চিনতে চান। আসাদের মতে, আত্মনির্মাণ একটি উদার মানবতাবাদী নীতি; আধুনিক/আধুনিকায়নকারী রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে যার বহুদূর ব্যাপ্ত নৈতিক, আইনী, রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা রয়েছে (পৃঃ

১৫)। তিনি আরো যুক্তি দেন যে, ক্রিয়াশীলতার সূত্র ধরে এজেন্ট চেনা আর চেতনার সূত্রে ধরে সাবজেক্ট চেনা কোনো অভিন্ন তাত্ত্বিক জগতের বৈশিষ্ট্য নয়; এই দুটো বিষয়কে নিম্নবর্গীয়রা তাদের ইতিহাস প্রকল্পে জুড়ে দিয়েছেন (পৃঃ ১৬)। নিম্নবর্গীয় সার্বোভৌমত্বের সন্ধানকে প্রত্যাখ্যান করে আসাদ ঔপনিবেশকারী এবং উপনিবেশিত-র সম্পর্কের উপর জোর দেন আর ব্যাখ্যা করেন কেন উপনিবেশিত-র ইতিহাসকে উপনিবেশকারী হতে পৃথক করা উচিৎ নয় (পৃঃ ১৮)। তালাল আসাদ এই সকল ইতিহাসবিদদের সরলীকৃত অনুমিতিকে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন, যখন কিনা তারা ধরে নেন যে, উপনিবেশকারী ক্ষমতা সকল সময়ই অবদমনমূলক; তিনি বরঞ্চ যুক্তি দেন যে, নিজের সম্প্রসারণের স্বার্থেই ভারতে ঐ ক্ষমতা ছিলো গঠনমূলক (পৃঃ ১৭)।

৩.৬ নৃবিজ্ঞানে সাংস্কৃতিক অনুবাদের প্রশ্নটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আসাদ, আরনেষ্ট গেলনার এর সাথে মতভিন্নতা প্রকাশ করেন। গেলনার ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীদের এই বলে অভিযুক্ত করেছিলেন যে তারা, 'আদিম সমাজের' উদ্ভট, অসংগতিপূর্ণ চর্চাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ির রকমের দয়ামায়া দেখিয়েছেন এবং ঐসব চর্চাকে গ্রহণযোগ্য অর্থ দিতে চেষ্টা করেছেন (পৃঃ ১৭৩)। তিনি দেখেন যে, নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন ঐ সকল সংস্কৃতি হতে যোগাড় করা তথ্যের ইংরেজীতে অনূদিত বাক্য পাঠকের মনে ঐ সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করে, যা কিনা প্রকারান্তরে নৃবিজ্ঞানের স্বজাতিকেন্দ্রিকতাকেই ইংগিত করে। গেলনারের মতে উদ্বিগ্ন নৃবিজ্ঞানী তখন ঝুঁকিটা এড়াতে পুরো বাক্যটাকেই পুণর্ব্যাখ্যা করেন (পৃঃ ১৭৮)। অন্যদিকে আসাদ এই বাক্য মিলিয়ে দেবার ধারণাটাকেই প্রত্যাখ্যান করেন আর বলেন যে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিদেশী ডিসকোর্সকে তাদের নতুন প্রেক্ষিতে মানানসই করে তোলাটা কোনো পূর্বশর্ত হতে পারে না (পৃঃ ১৯৯)। তিনি বরং এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, এহেন সাংস্কৃতিক অনুবাদ আদতে পশ্চিমের আত্ম-সংজ্ঞায়নই মাত্র। যা চূড়ান্ত অর্থে অসমতার সাথে যুক্ত (পৃঃ ১৯০) আর সেই অসমতা ভাষার অসমতার মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে (পৃঃ ২১৮-৯)। এই যুক্তি অনুযায়ী এথনোগ্রাফার ক্রিয়াবাদী হোন কিংবা পরিমার্জিত ক্রিয়াবাদী (গেলনার যেমনটা) হোন, তিনি আদতে কর্তা, যে অধঃস্তন সংস্কৃতির সুপ্ত অর্থকে উন্মোচন করেন।

৪. বইটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা পশ্চিমা চর্চা আর তার আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে, তার গৎবাঁধা ইমেজ তৈরীর রাজনীতিকে প্রশ্ন করে। বইটার যুক্তি বিন্যাস ইতিহাস হতে শুরু করে হালের প্রত্যক্ষণযোগ্য বাস্তবতা হয়ে জ্ঞানকান্ডগত চর্চা, সকল কিছুকেই ছুঁয়ে যায়। এটি মধ্যযুগের খৃস্টীয় চর্চাকে সেক্যুলার জাতি রাষ্ট্রের সাথে, উপনিবেশবাদকে উত্তর-উপনিবেশ যুগের সাথে কিংবা পশ্চিমকে অ-পশ্চিমের সাথে যুক্ত করে। আবার ক্ষমতার প্রশ্নে এসে এই বই জটিল উত্তরাধুনিক তত্ত্বকে চিরায়ত তত্ত্বের সাথে যুক্ত করে, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানকান্ডকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত করে। এভাবেই ফুকোডিয়ান বিশ্লেষণ কাঠামো ব্যবহার করে তালাল আসাদ তার ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞানের প্রস্তাবনা দাঁড় করান। সঙ্গতভাবেই যার কেন্দ্রীয় তদন্তের বিষয় পশ্চিম আর তার সাংস্কৃতিক হেজেমনি।

৪.১ আসাদের এই কাজ তৃতীয় বিশ্বের নৃবিজ্ঞানী হিসেবে আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটো কারণে। প্রথমতঃ নৃবিজ্ঞান নামক জ্ঞানকান্ডটার সিংহভাগ পড়াশুনা পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদের চর্চা দ্বারা প্লাবিত; যা আসাদ তার অপরাপর লেখালেখিতে স্পষ্ট করেছেন। তার মতে নৃবিজ্ঞান আগে ছিলো ঔপনিবেশিকতার দখল করা জ্ঞানকান্ড, যা পরবর্তীকালে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক হেজেমনির দখলে চলে যায়। এতে করে পশ্চিম-অপশ্চিমের যারাই জ্ঞানকান্ডে পড়াশুনা করুকনা কেন, তত্ত্ব প্রত্যয়, বিশ্লেষণ কাঠামোগতভাবে তাকে পশ্চিমের হেজেমনির দখলে যেতেই হবে, তালাল আসাদ স্পষ্টতঃই তার বিরোধী চর্চা তৈরী করতে চাইছেন। তৃতীয় বিশ্বের নৃবিজ্ঞানী হিসেবে যদি ঐ পশ্চিমা দখলে ভেসে না যেতে হয়, যদি ঐ দখল প্রক্রিয়াকে সনাক্ত আর প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়, তাহলে সেই কাজে আসাদ অগ্রগণ্য বলে আমি মনে করি। সেকারণেই, আলোচ্য বইটাতে জ্ঞান ও ক্ষমতার গাঁটছড়ার যে বিশ্লেষণ আসাদ হাজির করেন তা আমার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও উপভোগ্য। এই বইটা দ্বিতীয় যে কারণে আমি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়ি তা হলো আমাদের চারপাশের জীবন, সমকালীন পৃথিবী বুঝতে এর প্রাসঙ্গিকতা। তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হয়েও যে 'আধুনিক' পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেখানে ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবনের প্রায় সকল মূহুর্ত, প্রায় সকল অনুষঙ্গ কি করে উদারনৈতিকতাবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তা বুঝবার জন্যও তালাল আসাদ অবশ্য পাঠ্য। কথার কথা, আমরা আমাদের চার পাশে বহু ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত হিসেবে দেখতে পাই; যথা, গণতন্ত্র, প্রগতি, মৌলবাদ ইত্যাদি। এইসব ধ্যান-ধারণা নানা ঐতিহাসিক মূহুর্তে অকার্যকর, অচল, দেখবার পরও আমরা তাদেরকে

প্রশ্নহীনভাবে ধারণ করি। আসাদের পাঠ এহেন বোঝাবুঝির সংকটকে স্পষ্ট করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

৪.২ কিন্তু তালাল আসাদের যে আলোচনা আমাকে অধিকতর নাড়া দিয়েছে তা হলো ধর্ম ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ক তার বিশ্লেষণ, আসাদ স্পষ্ট করেছেন যে, ধর্মের বল প্রয়োগী চর্চার চাইতে স্যেকুলার বলপ্রয়োগী চর্চা শ্রেয়তর কিছু নয়। এমনকি তার মতে ধর্মীয় আর সেক্যুলার এর বিভাজনই ব্যবহারযোগ্য নয়। সেক্যুলার এর মধ্যে ধর্মীয় ব্যবস্থার উপাদান বাস করে; একইভাবে ধর্মের মাঝেও যুক্তিশীলতা রয়েছে যাকে সেক্যুলার/আধুনিকের আকর বৈশিষ্ট্য ধরা হয়। আসাদ আরো বলেছেন রেনেসাঁ-উত্তর ধর্মের সংজ্ঞায়ন দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে ভিন্ন স্থান ও কালের ধর্মকে বোঝা যাবে না; বুঝতে গিয়ে পশ্চিম নিরন্তর অন্যের গৎবাঁধা ইমেজ তৈরীর রাজনীতিতে মেতেছে। সর্বোপরি ধর্ম, আসাদ বলেন, সদাই ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত আর এই বিষয়টি নিয়ে তালাল আসাদ আদৌ বিচলিত নন।

এই শেষোক্ত প্রসঙ্গটিতে এসে আমরা যারা নিজেদের 'আধুনিক' কিংবা 'প্রগতিপন্থী' বলে ভাবি, তারা বড়ই বিচলিত, বিপন্ন বোধ করতে পারি, ধাক্কা খেতে পারি। আমাদের সমকালীন উপলব্ধিতে ধর্ম হলো পশ্চাৎপদ, প্রগতিবিরোধী বিষয়। তাকে 'মধ্যযুগীয়' প্রপঞ্চ হিসেবে গণ্য করি বলে, তার সাথে রাজনীতির যোগসূত্র দেখতে পেলেই আমরা আঁতকে উঠি। সেই আঁতকে ওঠার জায়গা থেকেই ধর্ম ও ক্ষমতার সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক আসাদীয় বিশ্লেষণ অনেকের কাছেই 'মৌলবাদী' মনে হতে পারে। তবে এক্ষেত্রেই প্রথমেই মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আসাদ, ধর্মীয়, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক নিরংকুশতাবাদী, (একইভাবে বলা যায় আধুনিক/মধ্যযুগীয়) এহেন যাবতীয় উদারনৈতিক দ্বিবিভাজনমূলক স্কীমেরই বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে সত্যিই ধর্ম ও রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বিশেষ করে বিচলিত হবার কোনো কারণ আছে কিনা? যদি কিনা লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি, ভাষা, ভূখন্ড নিয়ে রাজনীতি হতে পারে, তাহলে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির সমস্যাটা কোথায়? আশা করি পাঠক ধরে নেবেন না যে বাংলাদেশে জোট সরকারের নির্বাচন (২০০১) জয়ের পর সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর যে হামলা, নির্যাতন, গুজরাটে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর যে তান্ডব, কিংবা ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ওকালতিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে ভূমিকা, তাকে আমি সমস্যা বলে মনে করছিনা, কিংবা

তাকে খাটো করে দেখছি। আমি কেবল বলতে চাইছি একই ধরণের তান্ডব, হামলা, হত্যা নির্যাতন ধর্ম বাদেও অপরাপর প্রপঞ্চ, যেমন জাতি কি বর্ণকে কেন্দ্র করেও ঘটতে পারে, ঘটে থাকে। যখন রাজনীতিতে ফ্যাসিষ্ট শক্তির উত্থান ঘটে তখন তা নিজ প্রয়োজনে যেমন ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে, তেমনই জাতি, বর্ণ, কি লিঙ্গকেও ব্যবহার করতে পারে।

তৃতীয়তঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মাত্রই ফ্যাসিষ্ট হবে কিনা? বিগত ছয়-সাত দশকে পৃথিবীর বহুদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুণরুত্থান ঘটেছে; 'নয়া ইসলাম' 'আধুনিকতাপন্থী ইসলাম' এমনতরো নানা নামে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইরান, মিশর, তুরস্ক ইন্দোনেশিয়ায় জন্ম নিয়েছে নানা ধর্মভিত্তিক ইসলামী দল। মজার ব্যাপার হলো পশ্চিম ঢালাওভাবে এদের নাম দিয়েছে 'মৌলবাদী'; আমরাও এদের চিনেছি 'মৌলবাদী' বলেই। একথা সত্য যে নিজ সমাজে এরা বহু প্রশ্নে যেমন সমাজে নারীর অবস্থান প্রশ্নে, 'শিল্প সংস্কৃতির' চর্চা প্রশ্নে আধুনিকতার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে- কিন্তু তাতেই কি এদের এতো মোটাদাগে মৌলবাদী বলে অভিযুক্ত করা যায়? মনে রাখা উচিৎ ভীষণ রকম শ্রেণী বিভক্ত, দারিদ্র্য পীড়িত এই সব সমাজে 'আধুনিকতা', 'নারীবাদ' এদের কাছে পশ্চিমের স্মারক মাত্র; যে পশ্চিম তাদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারিত্ব জারী রেখেছে। তাই এই পশ্চিমকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তারা আধুনিকতার বিপরীতে গিয়েছে। নিজ সমাজের শাসক এলিটদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ঐ শাসকেরা যে আধুনিকতার তল্পি বহন করছিলো তার বিরুদ্ধেও লড়ছে ওইসব দেশের মানুষরা এর মধ্য দিয়ে নিজের সত্তাকে ধর্ম দিয়ে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছে। সেটা আপনার আমার তরিকা হবে কিনা তা তর্ক সাপেক্ষ হতে পারে। কিন্তু তাই বলে এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি নিছক ধর্মকে ব্যবহার করেছে বলেই তাকে আমি কেন সাম্রাজ্যবাদের দেয়া নামে (মৌলবাদী) ডাকবো? আর ডাকা তো কেবল ডাকা নয়, ডাকার অর্থ হলো সামাজ্যবাদের চশমা পরে ঐসব সমাজের রাজনীতিকে দেখা ।[১]

আফগানিস্তানে যে তালেবানরা লড়ছে, ইরাকে ফেদাইন হতে শুরু করে আজকের শিয়াসুন্নী যে যোদ্ধারা লড়ছে, তাদের একদিকের পরিচয় তারা 'মৌলবাদী' তারা 'স্বৈরতান্ত্রিক'; কিন্তু অন্যদিকের পরিচয় তারা নিজ ভূখন্ডের মুক্তির জন্যও লড়ছে,

আগ্রাসী পশ্চিমের বিরুদ্ধে লড়ছে, তাদেরকে তাই উদারনৈতিকতাবাদী পশ্চিমা ক্যাটেগরী যথা, গণতন্ত্র/স্বৈরতন্ত্র বা সন্ত্রাসবাদ কিংবা মৌলবাদ ইত্যাদি দিয়ে বোঝা যায় না, সে চেষ্টা করাও উচিৎ নয়।

৫. যদি স্রেফ ধর্মীয়/জাতিগত/লিঙ্গীয়/বর্গাগত/ভাষাগত পরিচয় কোনো জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত হবার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয় আর সেই জনগোষ্ঠী যদি ঐ পরিচয়টাকেই সামনে এনে প্রতিরোধের লড়াই শুরু করে, তাতে আমি কোনো সমস্যা দেখিনা। বরং আমি সমস্যা দেখি যখন ঐ লড়াইকে কতগুলো স্থূল ক্যাটেগরী ব্যবহার করে বুঝবার চেষ্টা করা হয়। একদিকে অধিপতি সাম্রাজ্যবাদ যখন লেবেল সাঁটার ইমেজ তৈরীর রাজনীতি করে, অন্যদিকে অনেক লড়াকু মানুষও তখন এই রাজনীতিতে সামিল হয়ে পড়েন, স্রেফ ঐ উদারনৈতিক পূর্ববিরাজিত ক্যাটেগরীগুলো ব্যবহার করেই।

এই ক্যাটেগরীগুলোর যে রাজনীতি আছে তা আসাদ উম্মোচন করেছেন তার বইয়ে। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় বোধকরি তা আরো ভালো উম্মোচন করেছেন বুশ আর ব্লেয়ার সাহেবরা । গণতন্ত্রের কথা বলে মৌলবাদ আর সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বলে (যা খুবই প্রগতিশীল শোনায়) তারা কত মুসলমানই না মারলেন।

আমরা যখন উদারনৈতিকতাবাদে ভাসতে ভাসতে মানবতাবাদের কথা বলি, সকল সন্ত্রাসের সমান নিন্দা করি (যথা টুইনটাওয়ার হামলা, হামাসের গাড়িবোমা হামলা আর মার্কিনের ইরাক দখল, ইসরাইলের হামাস নেতা হত্যা) কিংবা পূর্বাকার প্রেক্ষিত টান না দিয়ে স্রেফ যুদ্ধ থামাতে বলি। তখন আক্রান্ত আক্রমনকারীর ভূমিকাকে আমরা এক কাতারে নিয়ে আসি। একদিকে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার রাস্তার মিলিয়ন উদার যুদ্ধবিরোধী মানুষের ঢল নামে, অন্য দিকে প্রতি সেকেন্ডে ইরাক, মধ্যপ্রাচ্যে চলে হত্যা। উদারনৈতিক ঐ প্রতিবাদ কি প্রকারান্তরে উদারনৈতিক আধিপত্যেরই আরেক পিঠ হয়ে দাঁড়ায়? টিভি সেটের সামনে বসে বুশ-ব্লেয়ার যুদ্ধ বিরোধী মিছিল দেখে কি বলেন 'সাবাস গণতন্ত্র'? একেই কি আসাদ বলেছেন যে, এ হেন চর্চা একাধারে সেক্যুলার কিন্তু খৃস্টীয়, উদারনৈতিক কিন্তু রক্ষণশীল?

টীকা

[১] মৌলবাদ একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে গড়ে উঠা ক্যাটাগরি। তাকে ব্যবহার করার অর্থ হলো ক্যাটাগরিটি যারা নির্মাণ করেছে, তাদের ক্ষমতাকে এবং সেই নির্মাণ প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করে নেয়া। একই কারণে বাংলাদেশে জামায়াতের রাজনীতি কী ভারতে বিজেপির-রাজনীতিকেও আমি মৌলবাদী না বলে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী হিসেবেই চিনতে চাইবো। এক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী বলাটা কোন ক্যাটাগরিকে ইঙ্গিত করা নয় বরং তা রাজনীতির একটা বিশেষ ধরণের অনুশীলনকে ইঙ্গিত করে। বাংলাদেশে বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যেমন ভাবে ফ্যাসিষ্ট, জামায়াতের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদও তেমনটাই ফ্যাসিষ্ট, তবে জামায়াতের বাড়তি অর্জন পাকিস্তানী অধিপতি রাষ্ট্রের সাথে তার হাত মেলোনোর ইতিহাস। কিন্তু বিজেপি বা জামায়াতের উত্থানকে খুব সরল করে যদি বুঝতে চাই, তা হলে দেখা যায় উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী/বামপন্থী দলগুলোর ব্যর্থতাই এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানের পথ সুগম করেছে। যে পন্থায় তাদেরকে স্রেফ মৌলবাদী বলে মোকাবেলার চেষ্টা করা হয়, সেটা এই দলগুলোর রাজনৈতিক তৎপরতা কিংবা অর্জনকে বিশ্লেষণ করে দেখেনা, যা প্রকারান্তরে এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকেই নিশ্চিত করে।

মূলপাঠ্য ঃ

Asad, T. (1993) *Genealogies of Religion: Disciplines and Reasons of Power in Christianity and Islam*, The John Hopkins University Press, London.

আরও দেখতে পারেন ঃ

নিউটন, সেলিম রেজা, (সম্পা.), (২০০৩) '*মানুষ*' মানুষ আর প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা, *সন্ত্রাস-মিডিয়া যুদ্ধ সংখ্যা* সমাবেশ, ঢাকা।

Asad, T., (2003) Formations of the Secular, Christianity. Islam, Modernity, Stanford University Press, California.

-----ed. (1993) *Anthropology and the Colonial Encounter*, Ithaca Press, London.

---- (1991) From the History of colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony in George W. Stockoing Jr. ed. *Colonial Situations, Essays on the Contexualizations of Ethnographic Knowledge, History of Anthropology, Vol-7*. The University of Wisconsin Press, London.

Clifford, J., (1988) *The Predicament of Culture*. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press.

Geertz, C., (1993) (1973) *The Interpretations of Cultures*, Fontana Press, London.

Gellner, E., (1970) "Concepts and Society", in B. R. Wilson ed. *Rationality*, Oxford: Basil Blackwell.

Guha, R., and G. C. Spivak eds. (1988) *Selected Subaltern Studies*. New York: Oxford Univ. Press.

Ortner, S., (1984) "Theory in Anthropology since the Sixties," in *Comparative Studies in Society and History* 26, no. 1.

Sahlins, M., (1988) "Cosmologies of Capitalism: The Trans-Pacific Sector of 'The World System.'" *Proceedings of the British Academy 74.*